গণমাধ্যমের বিচিত্র ভ্রষ্টাচার

ইতিবাচক নির্মাণের স্বপ্ন

গণমাধ্যমের বিচিত্র ভ্রষ্টাচার

শরীফ মুহাম্মদ

অর্পণ

মাওলানা মুহীউদ্দীন খান রহ.

ইসলামের জন্য
উম্মাহ ও মানুষের জন্য
সাহিত্যচর্চা ও সাময়িকী-সাংবাদিকতায়
জীবনব্যাপী এক সংগ্রামের নাম

আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের
উঁচু মাকাম দান করুন।

গণমাধ্যমের জন্য বিনীত প্রয়াস

মিডিয়ার সাধারণ অর্থ করা হয়—গণমাধ্যম। সংবাদমাধ্যম শব্দের উদ্দেশ্যও একই নেওয়া হয়ে থাকে। এই গণমাধ্যম এখন প্রিন্টিং, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন—বহুমুখী মাধ্যমের ওপর ভর করে সময় ও পরিস্থিতির ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করছে। গণমাধ্যমের কাজ হওয়ার কথা ছিল—গণযোগাযোগের মাধ্যম হওয়া। গণমানুষের ভাষা ও আকুতির কথা নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা।

জোরালো প্রশ্ন এখন হৃদয়-মনে, গণমাধ্যম কি তার এ ভূমিকা পালন করছে? নাকি গণমাধ্যম অন্ধ-পক্ষপাত ও গণবিরোধী ভ্রষ্টাচারে ডুবে আছে? দেশ, মানুষ, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, ধর্ম, মূল্যবোধ ও ইতিহাসের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? এসব প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের কষ্ট, আবেগ, ক্ষোভ ও বিকল্প চিন্তার বিন্যাস।

এ বইয়ের সাতটি গদ্যে বা রচনায় সেই কষ্ট ও ক্ষোভের কিছু শিরোনাম ও কার্যকারণ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টান্ত, উপলক্ষ্য ও বিশ্লেষণসহ। গত দুই যুগের গণমাধ্যম পাঠ ও পর্যবেক্ষণ, গণমাধ্যমের মাঠ ও মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা এবং গণমাধ্যম বিষয়ক বিভিন্ন জার্নাল ও বইয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে এ বইয়ের উপাত্ত সাজানো হয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষের বিশ্বাসদীপ্ত ও ঐতিহ্যবাদী একটি হৃদয়ের চোখ নিয়ে সাতটি গদ্যে গণমাধ্যমের ভালোমন্দ সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বিচ্যুত গণমাধ্যমের ভ্রষ্টাচার থেকে বাঁচার উপায় এবং বিকল্প ও ইতিবাচক গণমাধ্যম-প্রয়াসের কিছু স্বপ্ন বুনে দেওয়ার। সংবাদমাধ্যমের প্রোপাগান্ডা বিষয়ক একটি অনূদিত লেখাও এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে—বিষয়ের সাযুজ্যের কারণে। আর এসব গদ্যের বেশক'টিই ২০১৫-১৬ সালে *মাসিক*

আলকাউসারে প্রকাশ হয়েছে। বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে লেখকের একটি সাক্ষাৎকার এবং দুটি বিষয়-সংশ্লিষ্ট বক্তব্য। আশা করি, গণমাধ্যমের ভেতরটাকে সরাসরি বোঝার জন্য দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্তি ভিন্নরকম স্বাদ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপহার দেবে।

গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ ও চর্চা এবং এ অঙ্গনে দ্বীনী শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের কিছু করবার ইতিবাচক স্বপ্ন এ বইয়ের গদ্যগুলোর প্রাণ। এ বইয়ের সব উপাত্তের আত্মা। গণমাধ্যম, রহস্য, মায়া, কৌতুহল ও বৈরিতা মেশানো এক হাতিয়ার। মানুষের মেজাজ ও সিদ্ধান্ত দখলের এ হাতিয়ারটিকে ভালো মানুষেরা কীভাবে দেখবেন, কীভাবে বাঁচবেন আর কীভাবে নিজেদের মতো করে সাজাতে চেষ্টা করবেন—তারই একটি খসড়া। তাই মিডিয়ার ভালোমন্দ নিয়ে যারা ভাবতে চান এবং ইতিবাচক কিছু করতে চান—তাদের জন্য বইটি কিছু পাথেয় জোগাতে পারে।

পাঠোপকরণ সরবরাহ, পরামর্শদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুহৃদ বন্ধুদের বহুরকম সহযোগিতা পেয়েছি। সবার প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। শেষ মুহূর্তে বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরে একটি ফ্ল্যাপ মন্তব্য আর প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, প্রথিতযশা সাংবাদিক সরদার ফরিদ আহমদ। এ উদারতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে রাহনুমার মাহমুদুল ইসলাম। তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিচ্যুত গণমাধ্যমের ক্ষতি থেকে বাঁচতে আমাদের প্রয়োজন ইতিবাচক গণমাধ্যমের প্রয়াস। সে পথেই আমাদের হাঁটতে শুরু করা দরকার। সুদৃঢ় কদমে, সদলবলে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

শরীফ মুহাম্মদ
পল্লবী, ঢাকা
৫ ডিসেম্বর ২০১৬

সূচিপত্র

গণমাধ্যম–গদ্য–১১
গণমাধ্যম না গোত্রমাধ্যম!–১৩
অনুকরণবাদী গণমাধ্যমের চেহারা–২০
গণমাধ্যমে মেধাহীন পুঁজি ও অন্যান্য–২৭
গণমাধ্যমের বিষাক্ত প্রভাব : বাঁচবো কীভাবে–৩৬
গণমাধ্যমে লঘু-গুরু প্রসঙ্গ–৪৭
গণমাধ্যম : ইতিবাচকতা নির্মাণের স্বপ্ন–৬১
গণমাধ্যম : ইতিবাচক অবয়বের রেখাচিহ্ন–৭৩
প্রোপাগান্ডা ও সংবাদমাধ্যম–৮০

গণমাধ্যম : কথকতা–৮৭
'এ দেশে এখন এই মানের কয়েক শ আলেম আছেন, যারা দ্বীনদার বিত্তশালী মানুষদের নিয়ে বসলে একাধিক শক্তিশালী মিডিয়া-হাউজ গড়ে তুলতে পারেন'–৮৯

'নিজেদের বাঁচানোর জন্য আমাদের বাউন্ডারি ওয়াল দরকার। সে বাউন্ডারি ওয়াল হলো গণমাধ্যম'–১০৫

'সারা বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ প্রতিদিন কী গ্রহণ করবে, এটা ঠিক করছে গণমাধ্যম'–১২২

গণমাধ্যম না গোত্রমাধ্যম!

পক্ষপাত সব ক্ষেত্রেই দূষণীয়। ন্যায়ানুগতা কিংবা ভারসাম্যের পথ ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো জুলুম। অন্যায় ও অবিচারের দুষ্ট পথ উন্মোচন। এ যে কেবল বিচার-আচারের বিষয়েই সীমাবদ্ধ—তা ঠিক নয়। বরং বহু ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে পারে। আর এ ধরনের অন্যায়ের মারাত্মক একটি জাতীয় বিষয় হচ্ছে গণমাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব। পত্র-পত্রিকা, টিভি-চ্যানেল, অনলাইন নিউজ পোর্টাল কিংবা রেডিও—সবকিছুই গণমাধ্যমের আওতাভুক্ত। সরল ভাষায় সাংবাদিকতা বলতে গণমাধ্যমের কাজকর্মকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

এই গণমাধ্যম বা মিডিয়াকে বলা হয়ে থাকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আইন বিভাগ (সংবিধান-সংসদ), বিচারবিভাগ ও শাসন বা নির্বাহী বিভাগের পরই এর অবস্থান। এ জন্য গণমাধ্যমে পক্ষপাত বা অবিচার কোনো অবস্থাতেই লঘু বা হালকা কোনো বিষয় হতে পারে না। এর ক্ষতি ও বিপর্যয়কে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। গত দুই যুগের বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে চলা সেই অবিচারেরই বিষময় ফল এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কেবল দৃশ্যমানই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাবসৃষ্টিকারী ও নীতিনির্ধারকের অবস্থান গ্রহণ করেছে। এ কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বোধ-বিশ্বাস ও স্বার্থের সঙ্গে গণমাধ্যমের তৈরি করা কুহকের সংঘর্ষ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যেটা না হওয়াই উচিত ছিল।

ধর্মপ্রাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের ভেতরের অভিযোগ হচ্ছে, এ দেশের সিংহভাগ গণমাধ্যম বিভিন্ন স্পর্শকাতর ইস্যু ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের

বিপক্ষে ভূমিকা রেখে থাকে। যেমন : ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের বিধান (ফতোয়া), ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক প্রয়াস, ইসলামী দাওয়াহ, ইসলামী পোশাক (বোরকা-হিজাব), ইসলামী আচার-আচরণ, ইসলামী উম্মাহর কোনো ঘটনা, ইসলামী দেশ ও জাতির কোনো ইস্যু, ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারা, ইসলামবিরোধীদের তৎপরতা ইত্যাদি। এসব ইস্যু এবং এ জাতীয় আরো ইস্যুর ক্ষেত্রে একশ্রেণির প্রভাবশালী গণমাধ্যমের কাজকর্মগুলো প্রায় পুরোপুরিই প্রবাহিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষের চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে।

কিন্তু এ কথাগুলোর প্রতি ওইসব গণমাধ্যম কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা পাত্তাই দিতে চান না। কোটি কোটি বিশ্বাসী মানুষের আত্মা ও মগজে বিষ ছড়ানোর দায় এবং তাদের ঠকানো ও বঞ্চিত করার প্রয়াসগুলো যেন তাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এটা যেন নিছক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার বিষয়; আর কিছুই নয়। উল্টো তারা গম্ভীরস্বরে বলে থাকেন কখনো কখনো—গণমাধ্যমগুলো তো মিথ্যা কিছুই বলছে না। যা দেখছে, যা শুনছে তা-ই তুলে ধরছে। অর্থাৎ তারা বলতে চাইছেন, ওইসব গণমাধ্যম সত্য তথ্য দিয়েই দায়িত্ব পালন করে থাকে। মিথ্যার কোনো ব্যাপার সেখানে ঘটে না। বাস্তবে তাদের এই অবস্থান কতটা সঠিক? এ যুক্তিতে তারা নিজেদের কতটা অবিচারমুক্ত প্রমাণের অধিকার লাভ করতে পারেন? ক্ষুদ্র পরিসরে তলিয়ে দেখলেও এ দাবির অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুই.

ব্যাপক অভিযোগ এটাই যে, ধর্মপ্রাণ মানুষের ইস্যুতে তারা যেকোনো পরিবেশনায় ইচ্ছাকৃত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে থাকে। কোনো ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তবুও দেখা যায় ঘটনাটা মন্দ হলে আর তার সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনসংখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকলে সেটাকে ফলাও প্রচার দেওয়া হয়। বারবার ফলোআপ করা হয়। বিশাল-ব্যাপক ইস্যুতে পরিণত করা হয়। তর্ক-বিষোদ্‌গার, ঘৃণা এবং নেতিবাচক দাবি-দাওয়া পর্যন্ত গড়িয়ে তবে বিষয়টা সমাপ্ত করা হয়।

অপরদিকে ঘটনাটি ভালো ও কল্যাণকর হলে আর সেটি কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাজ হলে অতি ছোট্ট একটি 'খবর' দিয়েই সেরে ফেলা হয় দায়িত্ব। পক্ষান্তরে ঘটনার সঙ্গে ইসলামবিরোধী মহলের সম্পর্ক থাকলে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যোগসূত্র পাওয়া গেলে কিংবা রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধি-বিধানের উল্টোস্রোতের ব্যক্তিদের সম্বন্ধ থাকলে এরাই খবরের ট্রিটমেন্ট-পরিবেশনার ধরন সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। বড় করার মতো খবরটিকে ছোট করে পরিবেশন করে আর ছোট হওয়ার মতো খবরকে পাঁচ-সাত কলামে মাতিয়ে তোলে।

এখানে হয়তো স্পষ্ট 'সত্য-মিথ্যার' কোনো ব্যাপার থাকে না। কিন্তু 'আকাশ-পাতালের' ব্যাপার থাকে। 'তিলকে তাল' বানানো আর 'তালকে তিল' করে দেখানোর কসরতটা একদম প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। আর এভাবেই ভারসাম্যহীনতার একটা দু'ধারা চাবুক দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিম মানুষ ও মানসের বোধ ও স্বার্থকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়ে থাকে। গত দুই যুগে এ দেশে এ ব্যাপারটাই বিপুলভাবে ঘটেছে। কেবল সত্য কিংবা মিথ্যা নয়, সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণেও একটা 'মিশ্রমত' গড়ে তোলার কাজটা করেছে প্রভাবশালী গণমাধ্যম।

যে কারণে গণমাধ্যমের ন্যায়ানুগ ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যে কারণে গণমাধ্যমের প্রতি অবিচারের অভিযোগ কোটি কোটি হৃদয়ে জেগে উঠেছে। ইসলামী শিক্ষা, অনুশাসন ও আদর্শ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে নানা প্রশ্ন উঠানো হলেও দেখা যায়, অন্য কোনো কোনো ধর্ম-গোত্র ও মহলের কুসংস্কার ও প্রকাশ্য দুরাচারের প্রতিও সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকছে একশ্রেণির গণমাধ্যম। এ জন্যই অবিচার ও ন্যায়হীনতার অনুযোগ-অভিযোগের দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে চারদিকে।

খবর ছোট-বড় করা ছাড়া গণমাধ্যমের অবিচারের আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে খবরটার ফলোআপ (আরও জের) প্রকাশ বা সম্প্রচার করা বা না-করা। এক্ষেত্রেও 'তিলকে তাল' বা 'তালকে তিল' বানানোর ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকে। এটাও দায়িত্বের দিক থেকে কোনো গণমাধ্যমের জন্য একটা বড় জুলুম। এর বাইরে আরেকটা বিষয় যেটা ঘটে, সেটা হচ্ছে সম্পাদকীয়

মতামতের ক্ষেত্রে, কলামধর্মী লেখায় এবং বিভিন্ন ফিচার ও অনুষ্ঠানে ওই বিষয়টাকেই টেনে নিয়ে আসা বা না-আসার একটা 'গেম' তৈরি করা। একটা ছোট্ট বিতর্কমূলক ঘটনা—(ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মাঝের) যেটা এক দিনই ঘটেছে। সেটার প্রচার-বিশ্লেষণে মাসখানেক বরাদ্দ করা এবং পরিবেশ বিষিয়ে তোলা। গণমাধ্যমের এ রকম আচরণের নজির বহু। 'তেতুলের তুলনা' বিষয়ক বক্তব্য নিয়ে তাদের মাতামাতি দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। অপরদিকে 'কালো বিড়াল' খ্যাত একজন সংখ্যালঘু রাজনীতিকের ঘন ঘন চরম সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক ও বালখিল্যতাপূর্ণ বক্তব্যের কথা ধরুন। হাবভাব দেখলে মনে হতে পারে গণমাধ্যম যেন তাকে 'পূজাই' করছে। সে হিসেবে শুধু খবর (নিউজ) মাত্র নয়, প্রভাবশালী গণমাধ্যম তার মতামতধর্মী আয়োজনেও একধরনের অবিচারমূলক 'স্বেচ্ছাচারিতা' চালিয়ে যাচ্ছে। এ যেন 'মুসলিম-বৈরী' গণমাধ্যম চর্চার এক উন্মাদ মহড়া। এবং সেটা ঘটছে এ দেশেই। নিজ দেশের বিনিয়োগ। নিজ দেশের সংবাদকর্মী। কিন্তু সুর উল্টো জনের। কথা ও ভাষা, দাবি ও স্লোগান বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার। সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে। মুসলিম ধর্মাচার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, গ্যাস-বিদ্যুৎ, বন্দর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আরাধনা-উৎসবে এদের ভূমিকা দিন দিন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ বিষয়গুলো এখন অনেকটাই ওপেন সিক্রেট। জানে এবং বোঝে সবাই। বলতে চায় না। গণমাধ্যমের সংঘবদ্ধ কোরাসের ভয় সবার মধ্যেই কাজ করে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, কৌশলী মিথ্যাচার। শব্দের প্রয়োগে, তথ্যের মিশেলে এই অসত্যাচার প্রায়ই তৈরি করা হয়। খবরের সঙ্গে মতামত মিশিয়ে নির্দোষ বিষয়কেও জটিল অপরাধ কিংবা গ্লানি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ঢালাওকরণ প্রচেষ্টা। যেকোনো নেতিবাচক বিষয় নিয়েই ইসলামপ্রিয় সব মানুষকে ঢালাওভাবে অভিযুক্ত ও অপরাধী সাব্যস্ত করার মহড়া শুরু করে দেওয়া হয়। এটাও মারাত্মক অন্যায়। এসব বিষয়ের ভেতর-বাইর প্রায় সময়ই দেশের সচেতন মানুষ পুরোটা অনুভব করেন। বেদনাও বোধ করেন। কিন্তু কলম ও ক্ষেত্র হাতে না থাকায় কিছু করে দেখাতে পারেন না।

তিন.

কেউ কেউ বলেন, শুধু মুসলিমবিরোধী আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রচার ও গণমাধ্যমের ভাষাই এ রকম বৈপরীত্যপূর্ণ ছিল। এখন সেটারই দেশীয়করণ করা হয়েছে। এ অর্থে মন-মগজ ও স্বার্থে পশ্চিমানুরক্ততা তৈরি হওয়ায় এ দেশের গণমাধ্যমে স্বজাতি ও স্বধর্ম বিরোধিতার এক স্বনিয়োজিত অধ্যায় চলছে বলা যায়। এতে নাকি এ দেশের সংবাদকর্মীদের একটা 'অবসরপ্রাপ্ত' কমুনিস্ট ও সেকুলারিস্ট অংশের মন ও পেশার মান রক্ষা হচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, পাশের দেশের সাংস্কৃতিক চেতনা ও গোয়েন্দাস্বার্থও এ জাতীয় প্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে। প্রবল সাম্প্রদায়িক ও খুনে একটা শক্তির হাতে পাশের বড় 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশের রাজত্ব। সে 'রাজত্ব' নিয়ে কোনো 'মোসাহেবি নিন্দা' করার সাহসও করে না এ দেশের গণমাধ্যম।

কিন্তু তারাই আবার এ দেশের নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলিমের বোধ-জীবনাচার ও শিক্ষা নিয়ে বিষোদ্গারের বন্যা ছুটিয়ে দেয়। আর এটাই হচ্ছে এদের বড় অবিচার। ন্যায়-বিরুদ্ধতা ও ভারসাম্যহীনতা। অভিযোগ রয়েছে, এরা একই ইস্যুতে মুসলিমদের গালি দেন। কিন্তু হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের পিঠে হাত রেখে পিঠচাপড়ানি দেন। এরা সাম্প্রদায়িকতার কথা কাদের বিরুদ্ধে বলেন? যারা উপমহাদেশজুড়ে অপর ধর্মীয়দের সাম্প্রদায়িক আক্রমণে প্রায়ই 'নিহত' হচ্ছেন। এরা 'কুসংস্কার' নিয়ে মুসলিম জীবনাচারের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করেন। কিন্তু ভিন্ন ধর্মীয় অমানবিক কুসংস্কারকেও মানবিক ও সাংস্কৃতিক একটি আবহ দিয়ে প্রচার করেন। এটা গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কোনো সুবিচার হতে পারে না। এবং এই অবিচার এখন আর উপেক্ষাযোগ্যও নয়। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে কথা! ব্যাপক প্রভাবক এই রাষ্ট্রীয় স্তম্ভের অবিচার ও ন্যায়-বিরুদ্ধতা এখন এ দেশের সভ্যতা ও ইতিহাসকেই যেন ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে। সুতরাং গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের মন ও বিবেকের কাছে আমরা আহ্বান রাখব, গণমাধ্যমের কোনো ব্যক্তিই যেন সভ্যতাধ্বংসী, বিশ্বাসবিরোধী ও জাতিবিনাশী খুনির হাতের দীর্ঘমেয়াদী 'চাপাতি' হিসেবে ব্যবহৃত না হই। এটা উচিত নয়। কারণ, এর নানামাত্রিক বিষফল গোটা সমাজকেই ধসিয়ে দিতে পারে।

একজন ইসলামী প্রাজ্ঞজন বলেছিলেন, 'সাংবাদিকতা হচ্ছে কোনো জাতির নির্মাণ কিংবা ধ্বংসের গদ্য।' সুতরাং গণমাধ্যমের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আবারও এর নির্মাণক্ষমতা সজীব করে তোলা দরকার। বন্ধ করা দরকার এর ধ্বংসাত্মক উপাদান ও উপলক্ষ্য। গণমাধ্যম তো সব মানুষের কথা বলবে। এ জন্যই তো সেটি গণমাধ্যম। কিন্তু মতাদর্শিক অতীত অথবা পশ্চিমা প্রভাব কিংবা প্রতিবেশী দেশ ও ধর্মের খুদকুঁড়োর ঋণ যেন গণমাধ্যমকে গোত্রমাধ্যমে পরিণত না করে—সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবার। রাষ্ট্রের প্রভাবশালী এই স্তম্ভটির পাহারাদারিও তো দরকার। মানুষ, দেশ ও সভ্যতার প্রয়োজনেই দরকার। এমন তো নয় যে সেখানে যারা আছেন সবাই ফেরেশতা। তাদের নৈতিকতার কোনো ক্ষয়-লয় নেই। খেদ-ক্ষোভ কিংবা আনুগত্য-দাসত্বের ব্যাপার নেই। আইন-বিচার ও শাসন বিভাগের সামনে যদি জবাবদিহিতার কাঠগড়া থাকতে পারে তবে গণমাধ্যমের 'পথচ্যুতি' কিংবা 'এজেন্ডাবাজি' নিয়েও তো শৃঙ্খলার 'শেকল' থাকা উচিত—বলাই যেতে পারে।

চার.

পথচ্যুত গণমাধ্যমের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কী কী করা যায়? প্রথম পথ তো হচ্ছে, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট সৎ ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের কাছে সত্য ও বাস্তবতাটি বারবার তুলে ধরা। গণমাধ্যমের তীব্র ও প্রকাশ্য অসঙ্গতিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পরিসরে দেশের মানুষকে, গণমাধ্যমের পাঠক-দর্শককে বাস্তবতার বিষয়গুলো তুলনা দিয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর উপায় চালু করা। এতে অনেক সুফল আসতে পারে। কারণ, একশ্রেণির গণমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা বা অবিচার নিয়ে জনসাধারণের মাঝে এমনিতেই যথেষ্ট ক্ষোভ ও সচেতনতা সক্রিয় আছে। তৃতীয়ত যেটা করা যায় সেটি হলো, বিকল্প গণমাধ্যম-কর্মী তৈরি এবং ইতিবাচক গণমাধ্যম নির্মাণের পথে যাওয়া। এটিই স্থায়ী ও প্রভাবক পদ্ধতি। অবশ্য অবিচারের শিকার হয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আইনি পদক্ষেপও নেওয়া যেতে পারে। এই অবকাশও স্বীকৃত ও চর্চিত। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও শক্তির কারণে বর্তমানে এর অন্যায়চর্চাও হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ব্যাপার যা-ই হোক, এ কথা সত্য যে মানুষ, মানবতা, বিশ্বাস ও নৈতিকতার সুস্থতার প্রয়োজনেই প্রয়োজন পক্ষপাতমুক্ত, ইতিবাচক গণমাধ্যম। ঐতিহ্যবাদী, শ্রদ্ধাপ্রবণ, শালীনতাসন্ধানী ও স্বাধীনতা রক্ষাকারী গণমাধ্যমের সাহায্যেই আমাদের দেশ সুস্থতার সঙ্গে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। অন্য কোনোভাবে নয়। সবার লক্ষ রাখতে হবে—গণমাধ্যম যেন মাত্র একভাগ মানুষের উদ্ভট পক্ষপাত ও বিভাজন-বেয়াদবির বাহন না হয়ে উঠতে পারে। ■

[*মাসিক আলকাউসার* : নভেম্বর ২০১৫]